ঊষসী
USHASI

Nistarini College

Yearly Journal, 2017-2018

নিস্তারিণী কলেজ

বার্ষিক পত্রিকা – ২০১৭-২০১৮

ঊষসী

নিস্তারিণী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা, ২০১৭-২০১৮

উপদেষ্টা ঃ নিস্তারিণী কলেজ শিক্ষক সংসদ

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ ড. ইন্দ্রানী দেব
অধ্যক্ষা
নিস্তারিণী কলেজ, দেশবন্ধু রেড, পুরুলিয়া - ৭২৩১০১

সম্পাদক ঃ শিক্ষক সংসদের পক্ষে
ড. প্রবীর সরকার

মুদ্রক ঃ আশুতোষ অফসেট প্রিন্টিং ওয়াকার্স, পুরুলিয়া

USHASI

Nistiarini College Yearly Journal, 2017-2018
Petron : Nistarini College Teachers' Council

Chief Petron : Dr. Indrani Deb
Principal, Nistarini College, Purulia - 723101

Publisher : Principal, Nistarini College
(On behalf of the Governing Body)

Editor : Dr. Prabir Sarkar
(On behalf of the Teachers' Council)

Printer :
Ashutosh Offset Printing Works,Purulia

সূচীপত্র

From the Principal's Desk	–	Dr. Indrani Deb	– ১
নিস্তারিণী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা ২০১৭-১৮			
প্রাক-কথন	—	সম্পাদক	— ২
আমার কলেজ বেলা	—	রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায়	— ৩
হুদুড়াঃ ছীনঃ হুদুড়ের অন্তর্ধান	—	সাম্যশান্তি কিস্কু	— ১১
ওরাঁও সমাজ	—	নির্মলা ওরাঁও	— ১২
ঘাসের আত্মকাহিনী 'রাত কহানী'	—	সঙ্গীতা মাহাতো	— ১৪
ঃ পশ্চিম সীমান্ত-রাঢ়ের আদি বিনোদন	—	ড. প্রবীর সরকার	— ১৫
প্রকৃতির আত্মরক্ষা	—	সোনালী রেওয়ানী	— ২৩
সাল দশ হাজার ষোল	—	প্রিয়াঙ্কা দত্ত, শিউলি মাহাত, সায়ন্তী মুখার্জী	— ২৫
বিদ্যাসাগর ও তাঁর জীবন দর্শন	—	অর্ণবী সেন	— ২৭
মাতৃ সুরক্ষা, এক সার্বিক চেতনা	—	সায়ন্তী মুখার্জী	— ৩০
Sister Nivedita	–	Madhurima Banerjee	– ৩১
ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	—	মৌসুমী মাহাত	— ৩৩
ভারতের নিবেদিতা	—	সোনালী পরামানিক	— ৩৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা	—	দেবপ্রিতা পাল	— ৩৯
সার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা	—	অন্তরা চক্রবর্তী	— ৪২
সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান	—	সুস্মিতা মাহাত	— ৪৫
আমার ইচ্ছা	—	শ্রীপর্ণা নাগ	— ৪৮
প্রভু বন্দনা	—	বাবলী বাউরী	— ৪৮
প্রকৃতির রূপ	—	পায়েল নাগ	— ৪৮
মনের কৌতূহল	—	শিখা চ্যাটার্জী	— ৪৯
বন্ধু	—	উমা স্বর্ণকার	— ৪৯
আমার ব্যথ্যা	—	ঝিলিক সরকার	— ৪৯
শহর শুধুই শহর	—	প্রিয়াঙ্কা দত্ত	— ৫০
নতুন করে	—	মানসী কুইরী	— ৫০
আবেগ পরাজয়	—	প্রকৃতি ব্যানার্জ্জী	— ৫১

আমি ও ভিন্ন	—	সুমনা পাত্র	—	৫১
নীলিমার প্রান্ত-রেখা	—	শুভ্রা মাহাত	—	৫২
অপূর্ব প্রেমের গল্প	—	লক্ষ্মী রেওয়ানী	—	৫৪
‘মশাসুর বধ’	—	নিতু কর্মকার	—	৫৫
নিজের সামর্থ্যই শ্রেয়	—	প্রিয়াঙ্কা নন্দী	—	৫৮
কলির স্বপ্ন	—	সপ্তপর্ণা সিং বাবু	—	৬০
আগামী	—	ইশিতা ভট্টাচার্য	—	৬২
Paradise falls	–	Riya Ghosh	–	৬৫
The Governing Body – 2018-2022			–	৬৭
Internal Quality Assurance Cell			–	৬৯
Teaching Staff			–	৭০
Library Staff			–	৭০
Part Time Teacher			–	৭১
Nistarini College Visiting Professor			–	৭১
Nistarini College Guest Lectures			–	৭১
Non Teaching Staff			–	৭২
Casual Staff			–	৭২
Hostel Staff			–	৭২

From the Principal's Desk

It is with the greatest pleasure and Pride that we present another issue of Ushashi – the very own magazine of the students of Nistarini College. This college has always aspired to provide an all-round education to the students, giving them apportunities in all spheres of life, so that every student will find a way to express her talents. As such, from the inception of this college in 1957, this magazine has seen the light of day year after year, Providing a platform for the deepest creative expresions of the students. These creative energies have taken the shape of poems, stories, essays and also sketches and paintings. All these expressions have delineated women power in all its manifestations – daughter, sister, mother and Nature – and that is exactly what this college stands for. Several articles in this collection are connected with Nature as a theme. Others are about family. Some deal with ideal men and women whom the students reverse and follow. In all the contributions there is a sense of idealism and goals lying ahead – and this is what we normally expect from young minds. The pages also contain inputs from the teachers of this college which goes to show that this magazine is a complete mouthpiece of all the human resources available here.

We invite the reader to go through these pages, and discover the young heart beating behind the lines. We trust that you will not be disappointed.

Dr. Indrani Deb
Principal
Nistarini College, Purulia

নিস্তারিণী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা ২০১৭-২০১৮ ঃ প্রাক-কথন

"নিস্তারিণী মহাবিদ্যালয়" বা Nistarini College জেলা তথা রাজ্যের গর্ব। রজত জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী, হীরক জয়ন্তী পেরিয়ে এখন আমরা শতবর্ষের পথরেখাটি স্পষ্ট'ই দেখতে পাই। একদা কিশোরী-তরুণী ছিল যে কলেজ, আজ সে ভরন্ত যৌবনা মদগর্বিত যুবতী। এমন একটি কলেজের বার্ষিক পত্রিকাকে আয়তনে ও বিষয়ভাবে যে গৌরবের অধিকারী হতে হয়, এবার আমরা সেই প্রত্যাশা থেকে হয়তো কিছুটা দূরে; সময়ের দিক থেকেও খানিকটা পিছিয়ে। সাফাই না দিয়েও বলা যায়, পাঠক্রমে CBCS চালু হওয়া, NAAC Visit-এর প্রস্তুতি ও তার সম্মুখীন হওয়া, ছাত্র সংসদের অস্তিত্বহীনতা - এগুলি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

তবু এগিয়ে এসেছে সাধারণ ছাত্রীরা, যারা দৈনন্দিন পাঠ্যগ্রহণের পাশাপাশি চতুর্দিকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিত্য সজাগ। তারাই জাতীয় সেবা প্রকল্পে অংশ নিয়ে কখনও স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হচ্ছে, কখনও যোগ দিচ্ছে নির্মল বাংলা প্রকল্পকে সফল করার কাজে।

বিগত এক বছরে শিক্ষাজগৎ থেকে শুরু করে রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ক্রীড়া, শিল্প-সাহিত্য, বৈদেশিক সম্পর্ক, পরিবেশ, ধর্ম ভাবনা, মহাকাশ-চর্চা, কৃষি-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আমাদের চারিদিকে। কেবল ক্লাসরুমের পাঠের জগতে আবদ্ধ না রেখে পরিবেশবিদ্যাকে আমরা মুক্ত করেছি জীবনের চারদিকে। চাই একে নিত্যদিনের জীবনচর্চার অঙ্গ করতে। ইতিমধ্যেই কলেজ ক্যাম্পাসটিকে আমরা প্লাস্টিক মুক্ত করতে পেরেছি, আর বৃক্ষরোপণকে অভ্যাসে পরিণত করতে চাইছি।

আমাদের অহংকার হলো এ কলেজের ঐতিহ্য। ডাক্তার নীলরতন সরকারের পরামর্শে অসুস্থ স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও কনিষ্ঠ কন্যা কল্যাণীকে নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এসেছিলেন পুরুলিয়ায়। সেটা ১৯০৪-এর শেষ দিক। শহরের উত্তর প্রান্তে বিশাল বাগানঘেরা সুন্দর একটি বাংলো বাড়ি, নাম "Clerk's Bunglow"। স্থানীয় লোকে মুখে আমেরি সাহেবের বাংলো। এই বাড়িটিই বাবা-মাকে উপহার দিলেন দেশবন্ধু এবং তার পর থেকে এটিই হয়ে ওঠে দাশ পরিবারের 'সামার হাউস'। এখানেই থাকতে আরম্ভ করেন চিত্তরঞ্জনের পিতা-মাতা - ভুবনমোহন দাশ ও নিস্তারিণী দেবী। ভুবনমোহন এ বাড়ির নাম দেন "রিট্রিট" — যা আজ আমাদের নিস্তারিণী কলেজ।

নানা সময়ে এ বাড়িতে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, পদ্মজা নাইডু, হুমায়ুন কবির, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থশংকর রায় থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রের বহু কৃতি মানুষ। এ কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।

কিন্তু কেবল ঐতিহ্যের পৌনঃপুনিকতায় আবদ্ধ থাকা নয়, আমরা চোখ রেখেছি ভবিষ্যতের দিকে। তার ফলস্বরূপ ২০০৪-এ National Assessment and Accreditation Council (NAAC) এর মূল্যায়ণে জেলার সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী কলেজ হিসাবে B++ (Grade) মান লাভ করেছিলাম। আবার ২০১৬ তেও NAAC এর মূল্যায়ণে জেলার সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী একমাত্র কলেজ হিসাবে "A" (Grade) পেয়েছে এ কলেজ। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখব।

বিগত একটি বছরে খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষকে হারিয়েছি। তাদের কেউ কেউ আমাদের অত্যন্ত নিকটজন। সকলকে আজ শ্রদ্ধা জানাই। সকলের কাছে প্রার্থনা, শিক্ষার আদর্শ পরিবেশটিকে বজায় রেখে আমরা যেন এগিয়ে চলতে পারি।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে

অধ্যাপক ড. প্রবীর সরকার

আমার কলেজ বেলা

— রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায়
(প্রাক্তন ছাত্রী)

প্রথম পর্ব

কিছু কিছু স্মৃতি মনে আনে অপরিসীম আনন্দ, ফিরে পেতে চাই বারেবার সেই দিনগুলো। আমার তিন বছরের জীবনের ঊনিশ কুড়ির সেই প্রাণোচ্ছল সময়টা মনের কোণে কোণে এখনো, এই মাঝবয়সেও এনে দেয় সবুজের ছোঁয়া।

উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট ও সেই বুকলেটে এল। এবারেও সেই একই, ৫০% নম্বরও জুটল না। তবে ইংরেজীতে প্রণব বাবুর মান রেখেছিলাম। যেখানে ২০০ র মধ্যে ৭০/৭৫ কি ৮০ পাওয়াই কঠিন ছিল, সেখানে আমর অতি সাধারণ ফাঁকিবাজ মেয়ের মার্কশীটে বাংলায় ১১৮ আর ইংরাজীতে ৯০ নং বেশ জ্বলজ্বল করছিল। আমাদের ব্যাচের অনেকেই আর্টসে ভাল করেছিল, কিন্তু তাদের অনেকের নম্বরের পাশে আমার ইংরেজীর নব্বই বেশ বলার মত হয়েছিল। বুবু সেবার ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। ভূগোলে লেটার।

স্কুল জীবন শেষ, এবার কলেজ। আমাদের বাড়ির কোন দিদিই কলেজ অবধি যায় নি, তার আগেই শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়েছে। তাই, মেয়েদের কলেজে ভর্তি হবার অনুমতি পেলাম।

পুরুলিয়া শহরে একটাই মেয়েদের কলেজ, দেশবন্ধুর মায়ের নামে নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়। নীল রঙের বাসে চড়ে কলেজের মেয়েদের যেতে দেখেছি । এবার আমিও যাব। এই ভেবেই উচ্ছ্বসিত। বুবু, রূপার সাথে গিয়ে একদিন কলেজের ফর্ম আনলাম। দেশবন্ধুর পুরনো বাড়িটার সামনের অংশে অফিস। আর পেছন দিকে পুরোনো হোস্টেল। কেউ কেউ পরামর্শ দিল ইংরেজিতে অনার্স নিতে। কিন্তু তাহলে তো পড়তে হবে, ফাঁকিবাজি চলবে না, আবার টিউশন নিতে হবে। তার চেয়ে বাংলাই ভাল শুধু টেক্সট পড়ে গেলেই হবে, যা লিখব বানিয়ে নিলেই হবে। এই ভাবনা নিয়েই বাংলা অনার্স লিখে ফর্ম ভরলাম। এবার আর অসুবিধা হল না অনার্স পেতে। পাশের সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স আর ইকনমিক্স লিখে ছিলাম। কিন্তু কয়েক মাস ইকনমিক্স ক্লাস করে সুজিত স্যার আর সুব্রতাদির অতি প্রিয় ক্লাসগুলোও কেমন যেন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাই সিদ্ধান্ত বদলে শোভাদির সাবজেক্ট ফিলজফি নিলাম। যেটা কিনা না পড়েই নাম্বার পেতাম।

মায়ের সাথে কলেজে ভর্তি হতে গেছিলাম। তারপর আমরা চার জন একসাথে আমলা পাড়া থেকে হেঁটে কলেজে যেতাম। তখনো ফ্রক পরি, দু একটা চুড়িদার, একটা সস্তার তাঁতের শাড়ি। এই ছিল আমার কলেজের ড্রেস। বাস ভাড়া কুড়ি টাকা আমাদের কাছে অনেক বেশি, তাই হেঁটেই যেতাম। বেতন ছিল, অনার্সের মাসে চোদ্দ টাকা, যারা অনার্স পায় নি, পাস কোর্সে পড়ত, তাদের দশ টাকা। আজকের দ্রব্যমূল্যের বাজারে যা অবাস্তব মনে হয়। তবু সেই ৫০ টাকার সবুজ সবুজ সস্তার তাঁতের শাড়ি, লাল ব্লাউজে প্রথম যেদিন কলেজে রওনা হলাম, অনেক মুগ্ধ চোখের চাউনিতে বেশ লাগছিল নিজেকে।

আমাদের অনার্সের জনা ষোল-সতের মেয়ে দোতলার একটি ছোট ঘরে দশটা থেকে বারটা রোজ ক্লাস করতাম। বাংলা ডিপার্টমেন্টে এর হেড ছিলেন কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা বলতাম কে.বি। বয়জ্যেষ্ঠ এই মহিলা অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা ছিলেন। ক্যান্টিনের পাশের সিঙ্গল কোয়ার্টারে থাকতেন। ছন্দের ক্লাসে কেউ পা দুলিয়ে ছন্দ আনতে চাইলেই, ওনার পড়ানোয় ছন্দপতন হত, বলতেন, পা দোলায় না বাবা, পা দোলায় না।

মাধবীদির ক্লাসের ইছামতী পড়ানো এখনো মনে পড়ে। সেই তিলু, বিলু নীলু তিনবোনের কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেওয়ার অপরাধে একই পাত্রের হাতে বিবাহিত হবার উপাখ্যান মাধবীদির সুন্দর বর্ণনায় আমরাও যেন পৌঁছে যেতাম ইছামতীর তীরের সেই গ্রামটিতে, সেই সময়ে।

বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতেন সদ্য যোগ দেওয়া আমাদের কনিষ্ঠ অধ্যাপিকা পাপিয়াদি, পাপিয়া ঘোষ। ওনার উচ্চারিত চন্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলীগুলো যেন কান পাতলে শুনতে পাই।

'চির চন্দন উরে হায় না দেলা,
সো অব নদীগিরি আতর ভেলা।'
কিম্বা
'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' অথবা
'সখী কি আর কহিব আমি, জীবনে-মরণে, জনমে-জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি।'

সব থেকে ভাল লাগত যাঁর ক্লাস, তাকে ক্লাসে বেশি পেতাম না। তিনি আমাদের ভীষণই প্রিয় যূথিকাদি। যূথিকা চট্টোপাধ্যায়। উনি পড়াতেন নাটক। যেহেতু এন.এস. এস. সহ কলেজের সাংস্কৃতিক দিকটা উনিই দেখতেন, তাই ক্লাসে ওনাকে কমই পেতাম। তবু যেদিন পেতাম সেদিন ক্লাস ছেড়ে বেরোতে ইচ্ছে করত না। ওনার পড়ানোর স্টাইল ছিল একেবারেই আলাদা। শুধু বিষয়বস্তু নয়, তার বাইরেও যে কত ভাবে, কত গল্প, উদাহরণ দিতেন, মন ভরে যেত। পরবর্তীকালে নিজে পড়াতে গিয়ে সেটাই চেষ্টা করেছি, পড়াকে আকর্ষণীয় করে তুলতে।

আমাদের প্রিন্সিপাল রেনু কুশারী ম্যাডাম থাকতেন কলেজ ক্যাম্পাসেই, গেটে ঢুকে ডান দিকে ছিল ওনার কোয়ার্টার। আলুথালু অগোছালো এই মহিলাও বড় ভাল মানুষ ছিলেন। আমাদের আবদার মন দিয়ে শুনতেন। ভাল লাগত হক স্যার, ইন্দ্রানীদি, ছবিদির পলিটিক্যাল সায়েন্স ক্লাস। তখন যেহেতু কলেজে ইলেভেন টুয়েলভ পড়ানো হত, তো আমাকে ফ্রক পরে ক্লাসে দেখে হক স্যার বলেছিলেন, তুমি এই ক্লাসের,আমি তো ইলেভেন পড় ভাবলাম!

বিনায়ক স্যার এর দর্শন ক্লাসে উনি জীবনের দর্শনের কথাও বলতেন। শ্রীলাদি ক্লাসে পড়া ধরতেন স্কুলের মত। দেখতাম ধূতি, পাঞ্জাবিতে পুরোহিত স্যার, সীতারাম স্যার সংস্কৃত আর হিন্দী ক্লাস নিতে যেতেন। কমলাদির পাশের কোয়ার্টারে রমাদি থাকতেন, যিনি কুকুরদের খাওয়াতে খুব ব্যস্ত থাকতেন। হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম, বাইক নিয়ে অমিতাভ স্যার ভূগোল ক্লাস নিতে এলে। এখন যেখানে অডিটোরিয়াম, সেখানে তখন কাঁকর ভরা খোলা মাঠ, ওখানে বসে ক্লাসের ফাঁকে গল্প, গানে আড্ডায় কাটতে লাগল আমার নতুন,মোহময় চিরতরুণ তিনটি বছর।

দ্বিতীয় পর্ব

কত স্মৃতি, কত ভাল লাগা, কত আনন্দ, ভাগ করে নেওয়া, জড়িয়ে আছে আমার ওই দিনগুলোতে। একসাথে সব ভীড় করছে মনের আনাচে-কানাচে। বুবুদের আমলাপাড়ার বাড়িতে আমরা তিনজন এসে জুটতাম। আমি, রূপা, শ্রীলেখা। একটা ছবি খুব মনে পড়ে। দশটা থেকে ক্লাস, আমি সাড়ে নটাতেই বুবুদের বাড়ি পৌঁছে যেতাম। এখন যেখানে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তার পাশে বিশাল মিত্রদের বাড়ির একটা অংশে ভাড়া থাকত ওরা। বেশ বড় বড় দুটো ঘর আর একটা ছোট ঘর যেটাতে বুবু থাকত। আর ছিল বেশ বড় একটা বারান্দার পাশে রান্নাঘর। তবে কাকিমা বারান্দাতেই রান্না করত। মাটিতে উনুন পেতে কাকিমা আর বুটু গোছা গোছা রুটি সেঁকত। আর বুবু

কলেজে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বারান্দায় পাতা জলচৌকিতে বসে ভাত খেত। কাকিমার কাছে শুনে শুনে তখন নতুন নতুন রান্না শিখে বাড়িতে বানানোর অক্ষম প্রচেষ্টা করতাম। নিমবেগুন, মুলোর ভর্তা এইসব রান্না তখন আমার অচেনা।

পায়ে হেঁটে শীত- গ্রীষ্ম-বর্ষা- বসন্তে তিনটে বছর কত সুখ-দুঃখের গল্প করতে করতে আমরা চারজন অনেকটা দূর পথ পৌঁছে যেতাম। কখনো যেতে যেতে গাড়িখানার কাছে এসে পেছনে শ্যামের বাঁশি, মানে কলেজের বাসের হর্ণ বেজে উঠলেই খুশি! খালাসি যুধিষ্ঠির দা আমাদের তুলে নিত বাসে, ওইটুকু পথ আর হাঁটতে হত না।

দশ টা থেকে বারটা অনার্সের ক্লাস, তারপর ক্যান্টিন এর রাজুর চা, মাঠে আড্ডা, গান, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ক্লাশ, আর এডিশনাল ক্লাস করে আসা। কখনো লাইব্রেরিতে গিয়ে রেফারেন্স বই নিয়ে পাতার পাতা নোট লেখা, এই স্বর্ণালী দিনগুলো আরো বর্ণময় হয়ে উঠত কলেজের অনুষ্ঠান গুলোর সময়।

নবীনবরণ হল। প্রথমবার এইরকম একটা অনুষ্ঠানে ফুল, চন্দন, উপহার পেয়ে নিজেদের খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। আমার বন্ধুভাগ্য বরাবরই ভাল। এখানে এসেও পেলাম আরো কয়েকজনকে, যাদের না পেলে আমার জীবন অপূর্ণই থেকে যেত। আমাদের বাংলা বিভাগে মালদা থেকে এসেছিল মিত্রা ওঝা। লম্বা ফর্সা, অনেকটা ইতিহাসে পড়া আর্যদের মত চেহারা। সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়ে আমাদের সাথে বাংলা অনার্সে ভর্তি হয়েছিল। মেধাবী মিত্রা আমাদের ব্যাচের টপার ছিল। কিন্তু ওর একটা সহৃদয়, অনুভূতি প্রবণ মন আমাদের খুব কাছাকাছি এনেছিল।

বাংলা বিভাগে পুরনোদের মধ্যে যেমন ছিল দোলা, সোনালী, মুমু, মৃধা, মহুয়া। আরো পেলাম স্বর্ণলতা, নমিতা, বাবলি। এছাড়াও আমাদের একই ইয়ারের হোস্টেলে থাকা বেশ কয়েকজন বন্ধু হয়ে উঠল, অদিতি, টোকি, মহুয়া। আবার ডে স্কলার পাশ কোর্সের কিছু বন্ধু তমালী, শর্মিষ্ঠা, মন্দিরা, সুচেতা, পলি আমরা সবাই ক্লাসের ফাঁকে গেটের বাঁ পাশের এবড়োখেবড়ো মাঠে গল্প-গানের আসরে বসতাম। যতক্ষণ না গাছে ঝোলানো রেলের লাইন ভাঙা লোহাটায় কেউ ঘা দিয়ে দুটো পনের কি তিনটের ঘন্টাটা বাজিয়ে দিচ্ছে।

টিউশন থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে কিনতে লাগলাম সস্তার কিছু জামা, শাড়ি যাতে কলেজে রকমারি পরতে পারি। ঝোলা দুল পরে বেশ সেজেগুজে কলেজে যেতাম। পথে কত মুগ্ধ দৃষ্টি আমাদের তারুণ্য ছুঁয়ে যেত, অবহেলায় তাদের ভ্রুক্ষেপ না করে এক অদ্ভুত আনন্দে গা ভাসাতাম।

তৃতীয় পর্ব

একদিন যূথিকাদি ক্লাসে এসে বললেন বই মেলায় প্রোগাম হবে। কারা নাচ করতে পারবে? আমাদের কম্পালসারি বাংলা ক্লাসে সব বিভাগেরই মেয়েরা ছিল। তাদের মধ্যে শুক্লা, আরো কয়েকজন নাম দিল। আমারও খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সেই ছোটবেলায় শিশুশিক্ষা স্কুলে মর্জিনার ঝাঁটা হাতে নাচ করার পর আর কখনো সেভাবে সুযোগ পাইনি। স্কুলে সবাই নাচ করত দেখতাম। বাড়ি ফিরে দিদাকে এসে সেই নাচ করে দেখাতাম। কিন্তু কখোনো মুখ ফুটে নাচ করব বলতে পারিনি। যাইহোক শানুদি, মানে যূথিকাদির মানস কন্যার তত্ত্বাবধানে যূথিকাদির বাড়িতে ওরা রিহার্সাল শুরু করল।

কিভাবে যেন একদিন বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেল। যূথিকাদি একদিন ক্লাসে এসে আমাকে বললেন, এই তুই তো নাচ করতে পারবি? তুই আসবি আজ থেকে আমার বাড়িতে। খুব খুশি, স্কুলে যখন কোনমতেই যুযোগ পাইনি, এবারে পেলাম সেই সুবর্ণ সুযোগ । ক্লাসের পর কলেজের উল্টো দিকে একটা ভাড়া বাড়িতে

যূথিকাদি, আর শানুদি থাকতেন। শানুদিও বাংলা অনার্স, আমাদের সিনিয়র। গ্রামের স্কুলের টিচার। শানুদি স্কুল ফেরত এসে আমাদের নিয়ে শুরু করত নাচের মহড়া।

তখনও সেভাবে গান বাজিয়ে প্রোগ্রামের রেওয়াজ ছিল না। ক্যাসেট থেকে গান তুলে মুখে গেয়ে নাচ প্র্যাক্টিস হত। ফলে গায়ক- গায়িকা, আর নাচের মেয়েদের এক সুন্দর মেলবন্ধনের সুযোগ ছিল। আমাদের বাংলা অনার্সের দোলা ছিল মূল গায়িকা আর যেহেতু আমাদের মেয়েদের মধ্যে থেকেই ছেলে সাজা হত, তাই ছেলেদের গলায় গান গাইবার জন্য অরূপদাকে যূথিকাদি ডেকে এনেছিলেন।

সেবার অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল ভারতীয় লোকনৃত্য। যূথিকাদির সুন্দর আলেখ্য রচনায় অসমীয়া, রাজস্থানী, ওড়িয়া, তেলেগু, গোনানিজ বিভিন্ন প্রাদেশিক নাচের সঙ্গে বাংলার লোকনৃত্যের অপূর্ব পরিবেশন সম্ভব হয়েছিল। যার মূল কান্ডারী ছিল শানুদি। শানুদির পরিচালনার গুণে আমাদের মত অনভিজ্ঞ মেয়েটাও তালে তালে পা মিলিয়েছিল। অরূপদা প্রথমদিন আমায় দেখে বলেছিল, তুমি কি আগরওয়াল, বা ঝুনঝুনওয়ালা? আমাকে নাকি ওরকম দেখতে!

আমাদের নাচ তোলা হত ক্লাসের পর। তবে যেদিন রিহার্সাল থাকত, যূথিকাদির বাড়িতে চা টিফিন ছিল ধরাবাঁধা। শিঙাড়া, চপ, জিলিপি, গজা বেশ আকর্ষণ ছিল ওই টিফিনটার প্রতি। সাথে নিজেদের নাচ তো ছিলই, আবার বাকি নাচগুলোও তুলে ফেলতাম দেখে দেখে। শানুদির সাথে শুক্লাদি, মানে শুক্লা ঘটক অনবদ্য জুটি তখন। সেই সঙ্গে আমাদের শুক্লা, আর সদর পাড়ার অপর্ণা, রুমা ব্যানার্জী, সুরভী, বুবু, আরো বেশ কয়েকজন জুনিয়র মেয়ে মিলে শানুদির প্রশিক্ষণে তৈরি হতে লাগলাম বইমেলায় অনুষ্ঠানের জন্য।

এখনো চোখ বুজলেই মনে পড়ে সেই একতলা ইটের পলেস্তরাহীন বাড়িটা, যার একটাই বড় হলঘরে চলত সুর ও ছন্দের তালে তালে একদল সদ্য কৈশোর ছাড়ানো মেয়েদের অনুপম বেলাযাপন। বড় ভাল ছিল সেই বিকেলগুলো।

"তিউ পিয়ারি গাঁউমা, রাম আইলা ছাউমা", এই অসমীয়া গানের তালে তালে নাচ শুরু হত। তারপর, "ও কুঠা বিচে ছা গইয়া বাদারি তু, তু নানহিরে তু, তু বাদারি রে তু আয়া মেরা দেশ মে", বর্ষার এই রাজস্থানি নাচে পা মেলাত শুক্লা, আর তার দুই সঙ্গী। ওড়িয়া গান "ঘুম ঘুমাসি ঢোল মাদল", এর তালে তালে আমি, রুমা সুমিতা বেশ কোমর জড়িয়ে পা ফেলতাম। গোয়ানিজ গান, "চিও চিও চি" তে নাচ করেছিল বুবু আরো তিনজন। সুরভী আর আরও কয়েকজন মেয়ে ছেলে সেজে তেলেগু মাঝিদের নাচ, "কডলি ন কর পোন রে", গানে নাচ করেছিল।

সবশেষে ছিল বাংলার নাচ। হেমন্ত-লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া সেই অসামান্য গান, "দে দোল দোল দোল, তোল পাল তোল", গানে যূথিকাদির ঘর মুখরিত হত দোলা আর অরূপদার গলায়। তার সাথে শানুদি আর শুক্লাদির মাঝি, আর মাঝি বৌএর নৃত্য অপূর্ব যুগলবন্দী আমাদের মন ভরিয়ে দিত। হ্যাঁ দর্শকদেরও বারবার আমরা এই নত্য আলেখ্য উপহার দিয়েছি। যার সূচনা হয়েছিল বইমেলাতেই।

আর একজন যার সূত্রধারে এই নৃত্য আলেখ্য এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল, তাকে পেলাম রিহার্সাল এর একেবারে শেষের দিকে। তখন নাচ, গান সব তৈরী। একদিন যূথিকাদির বাড়িতে দেখলাম উজ্জ্বল বাদামী চোখের লম্বা দোহারা চেহারার এক দাদাকে। অসামান্য তার গলার আওয়াজে যূথিকাদির লেখা স্ক্রিপ্টে পড়ে প্রতিটা নাচের কথা দর্শকদের কাছে তুলে ধরবে। শুরু হল সেইভাবে প্র্যাক্টিস। জানলাম, নাম অরিন্দম চক্রবর্তী। তখনও জানতাম না সেদিনের সেই শান্ত ছেলেটিই পরে অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে খবর পড়ে আমাদের পুরুলিয়াকে গর্বিত করবে।

চতুর্থ পর্ব

সেই তরুণী বেলায় আবার পেলাম কিছু প্রাণের বন্ধু। যাদের কাছে আজও আমি আমার আমিকে খুঁজে পাই, যাদের থেকে দূরে থাকলেও থাকি মনের কাছাকাছি। আমাদের অনার্সের মিত্রা, আর ভূগোল অনার্সের হেমন্তিকা। দুজনেই লেখাপড়ায় ভীষণই ভাল। মিত্রা আমাদের বাংলার টপার, আর হেমন্তিকা ভূগোলের। মিষ্টি হাসি মুখের হেমন্তিকা বাঁকুড়ার খাতড়ার মেয়ে। ওর দুই দাদা পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্কের টিচার। তাই ওর পাশ সাবজেক্ট ছিল অঙ্ক আর ইকনমিক্স। ইকনমিক্স ছেড়ে দিলেও হেমন্তিকাকে ছাড়িনি। আমার মত অঙ্ক থেকে দূরে থাকা বন্ধুকে কাছে টেনে নিতে দেরি করেনি। আজও হেমন্তিকা, মিত্রা দূরে থেকেও আমার খুব খুব কাছের।

এই সময়েই ছবিদি, দুই ইন্দ্রানীদি, হৃদয় স্যার এনারা নতুন জয়েন করলেন। পাপিয়াদির সাথেই কলেজের পেছন দিকে লম্বা স্টাফ কোয়ার্টারে ছবিদি থাকতেন। ছবিদির ঘরে ছিল আমাদের অবাধ আনাগোনা। আমি আর শ্রীলেখা প্রায়ই ওখানে গিয়ে চা বানাতাম, স্যাররা, অন্যান্য দিদিরা এলে ওনাদের দিতাম। নিজেরাও খেতাম। ভাবতাম, আকাশকুসুম,আমিও যদি এমন চাকরি করতাম।

এরপর এন এস এস ক্যাম্প হল এক ছুটির দিনে। যূথিকাদি সবাইকে কাজ ভাগ করে দিলেন। কলেজ সাফাই অভিযান, তার সাথে দেদার ভূরিভোজ। সকালে ডিমসেদ্ধ, কেক, কলা আর চায়ের পর শুরু হল কাজ, তবে আমার ভাগে রান্নাঘরে কাজ পড়েছিল। বেশ ফাঁকিবাজি ডিউটি, আর যথেচ্ছ চা খেয়ে দুপুরে মাংস ভাত আর খেতে পারিনি। বিকেলে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কত গানে, নাচে, কত আনন্দের স্রোতে কাটছিল সেই কলেজবেলা।

ফেয়ারওয়েলে মাধবীদির পরিচালনায় করলাম রক্তকবরী, শ্রুতিনাটক। স্কুলের মত ব্যাকবেঞ্চে নয়, এখানে আমি বেশ গুরুত্ব পেতাম। ক্লাসেও আমার নোট নেওয়ার খাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। আর রক্তকবরীতেও মাধবীদি বিশুপাগলের চরিত্রটা ভালবেসে আমাকেই দিয়েছিলেন। রশ্মি হয়েছিল রাজা, শ্বেতা হয়েছিল ফাগুলাল। আর নন্দিনী হয়েছিল মহুয়া। যে রশ্মি, মহুয়া পুরুলিয়ার যে কোন কম্পিটিশনে সবসময় প্রথম হয়, সেই তাদের সাথে এক মঞ্চে নাটক করার সৌভাগ্য হল। মহুয়ার গলায় 'ভালবাসি ভালবাসি' কতদিন শুনিনি। আমি অবশ্য আজও গাই, 'তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ, ওগো ঘুম ভাঙানিয়া, ওগো দুখ জাগানিয়া।'

যূথিকাদির তত্ত্বাবধানে, আর শানুদির পরিচালনায় তখন একের পর এক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে কি যে ভাল লাগত! একবার মন্ত্রী অম্বরীশ মুখার্জির উপস্থিতিতে নজরুল গীতি দিয়ে সাজানো নৃত্য আলেখ্য করা হল। অপর্ণা, শুক্লা সেবার শিউলিতলায় ভোরবেলায় নাচল। আমরা করেছিলাম, ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল রে। শুধু নাচ নয়, গণসঙ্গীতের প্রতিযোগিতাতেও তখন নিস্তারিণী কলেজের টিম প্রথম। গেয়েছিলাম, 'আমরা এই দুনিয়ায় জীবনের গান শোনাই', আর, 'আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি'। সুরভী, বুবু, শুক্লা, রুমা ব্যানার্জী, দোলা, এদের সাথে আমিও গলা মেলাতাম। এভাবেই প্রথম বর্ষ পার করে ফেললাম টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে। তখন দু'বছর পর অনার্সের পার্ট ওয়ান আর পাশ কোর্সের পরীক্ষা হত। তৃতীয় বছরে শুধু পার্ট টু হত। তাই অবলীলায় দ্বিতীয় বর্ষে পা দিয়েই ভূগোলের এক্সকারশনে দীঘা বেড়ানোর সুযোগ পেলাম। সে গল্প পরের পর্বে।

পঞ্চম পর্ব

ভূগোলে নম্বর থাকলেও আঁকাজোকা আমার দ্বারা হবে না, এই ভয়ে গ্র্যাজুয়েশনে আর ভূগোল নিইনি। কিন্তু যখন দেখলাম পাশ কোর্সে যাদের ভূগোল আছে, তারা এডুকেশনাল ট্যুর এ দীঘা যাচ্ছে, খুব ইচ্ছে করছিল

ওদের সাথে যাবার। কিন্তু আমি তো চান্স পাব না।

আমাদের চার সঙ্গীর মধ্যে রূপা হালদার এর পাশ কোর্সে ভূগোল ছিল। ও এসে খবর দিল ওদের একজন মাড়োয়ারি মেয়ে আরো কয়েকজন মাড়োয়ারি মেয়েকে ওর সাথে নিয়ে যেতে চাইছে। আঙুরদি, মানে আমাদের ভূগোলের তখনকার হেড অফ ডিপার্টমেন্ট, নাকি তাতে রাজী হয়েছেন। সেই কথা জেনে আমার মনে একটু আশার সঞ্চার হল, রূপাকে বললাম, আমি কখনোও সমুদ্র দেখিনি, আমার খুব যাবার ইচ্ছে। রূপা গিয়ে দিদিকে বলতেই, দিদি রাজী হয়ে বলেছিলেন, আর যেন কেউ না জানে। আর আমায় পায় কে?
বাড়ি ফিরেই বাবাকে জানালাম। আমাদের মত নিম্নবিত্ত পরিবারে তখন বাড়তি ১২০ টাকা খরচও বেশি মনে হয়। তবু বাবা পরদিনই খুশি হয়ে টাকাটা দিয়ে দিল। আমাদের ১২০ টাকা, আর যাদের ভূগোল আছে তাদের ১০০ টাকা। তিনদিন থাকা খাওয়া! কি আনন্দ!

বেশ কয়েকদিন কল্পনা-জল্পনার পর অবশেষে সেই দিন এল, বাবার সাথে রিক্সা চড়ে সন্ধ্যেবেলা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। দেখি শানুদি, ছবিদিও আমাদের সাথে যাচ্ছেন। আমরা চক্রধরপুর হাওড়ার ট্রেন ধরে খড়গপুরে নামলাম। প্রথমবার রাতের ট্রেনে চড়া, প্রথমবার বন্ধুদের সাথে বাইরে যাওয়া, প্রথমবার সমুদ্র দেখা। সব মিলিয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দে তখন মন চঞ্চল। মাঝরাতে খড়গপুরে নেমে, বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষার পর বাস ধরে সমুদ্র যাত্রা। কিন্তু সেই প্রথম চার পাঁচ ঘন্টার বাস জার্নিতে আমি কাহিল। কাঁথিতে নেমে গা গুলিয়ে বমি। ছবিদি এসে মাথায় জল দিয়ে কিছু খেতে বললেন। তারপর আবার বাসে চড়ে রওনা দিলাম। দীঘার সরকারী গেস্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। 'সংযোজন' এ মেয়েরা, আর কুইরি স্যার আরো কোন পুরুষ স্টাফ গিয়েছিলেন ওনারা পাশেই 'ছায়ানট' এ থাকলেন। একটা রুমে চারজন। দু'জনের রুমে চারজন। তবু কোন অভিযোগ ছিল না, ছিল শুধুই নির্ভেজাল আনন্দ। রূপা আর আমি একটা বেডে আর আরেক রূপা, রূপা মুখার্জী আরেকটাতে। পেছনেই সমুদ্র, ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দেখব বলে কৌতূহল এর সীমা নেই। আঙুরদি আমাদের সবাইকে সমুদ্রে স্নান করাতে নিয়ে চলেন। গেস্ট হাউসের গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়েই দেখি সীমাহীন, দিগন্ত বিস্তৃত অবাধ জলরাশি, আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। আমার প্রথম সমুদ্র দর্শন। রূপাকে ধন্যবাদ জানাতে পারিনি, কিন্তু আমার প্রথম সমুদ্র দেখা তো শুধু ওর জন্যই। ও না বললে তো আমি আসার অনুমতিই পেতাম না।

শুধু দেখাই নয়, আপাদমস্তক ঢেউ এর ছোঁয়ায় সে প্রথম সমুদ্র স্নান আমার তরুণ প্রাণে যে হিল্লোল তুলেছিল আজও তার রেশ রয়ে গেছে মনে।নোনা জল চুলে, মুখে, মনে নিয়ে গেস্ট হাউসে ফিরে রেডি হয়ে দল বেঁধে লাঞ্চে গেলাম, সৈকত হোটেলে। মিল সিস্টেমে খাওয়া। ভাত, ডাল, ঝুরি আলুভাজা, আর মাছ। ঝুরি আলুভাজা চাইলেই আরো পাওয়া যেত, তাই ওটাই বেশি নিতাম। যে ক'দিন ছিলাম, দিনে রাতে ওখানেই খাওয়া। এর পরেও দীঘা গেছি কয়েকবার কিন্তু সেই হোটেলে, সেই রান্নার স্বাদ আর খুঁজে পাইনি। হয়তো সেদিনের, সেই নবীন কিশলয়ের মত মনটা আজ হারিয়ে গেছে।

তখনও দীঘার বীচে এত দোকানের পশরা ছিল না, ছিল এবড়োখেবড়ো পাথরে ভরা নিবিড় সমুদ্রতট। সূর্যালোকের উজ্জ্বল আভায় আমরা হেঁটে গেছি ঝাউবনের পথে পথে। গেস্ট হাউসের সামনের ঝুপড়ি দোকানের লুচি তরকারি দিয়ে জলখাবার সেরে, ভূগোলের মেয়েরা যখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত, আমি তখন গেস্ট হাউসের বাইরে ফুটপাতে বাবার দেওয়া স্বল্প টাকায় ভাইবোনের জন্য ছোটো খাটো উপহার কিনেছি। ফিরে আসার আগের সন্ধেটা খুব মনে পড়ে, শানুদি, ছবিদি, সহ আমরা সব মেয়েরা সমুদ্রের ধারে বসে আছি। শানুদি বলল গান

গাইতে, আমি গান ধরলাম, আরতি মুখার্জির গাওয়া, ভাললাগার এই শুভক্ষণ, ভাল লাগা ঘিরে আছে মন। মাঝের কয়েকটা লাইন ছিল, তুমি আছ বলে, নদী ঢেউ তুলে, সব হল আরো যে আপন। তাই শুনে আমার অবাঙালী বন্ধু রঞ্জিতা তার হিন্দী অনুবাদ করে ওর বন্ধুদের বলে দিচ্ছিল। সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় ফেলে আসা ওই সন্ধ্যেটা আমার জীবনের সেরা সন্ধ্যে হয়ে রয়ে যাবে আমৃত্যু। আজ শানুদি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে, তবু সেই সন্ধ্যেটা রয়ে গেছে স্মৃতির মণিকোঠায় সতেজ, সজীব। ছবি নেই, সেই সেদিনের প্রথম ভ্রমণের, আছে শুধু স্মৃতির পসরা, রোমন্থনেই তার পুনর্জন্ম।

শেষ পর্ব

দেখতে দেখতে চলে এল পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা।

অনার্সের চারটে পেপার এর সিট পড়েছিল শহরের একমাত্র কো-এড কলেজ, জে কে কলেজ এ। দুপুর বারোটা থেকে চারটে, টানা চার ঘন্টায় চারটে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হত। প্রতিটা প্রশ্ন ২৫ নম্বরের। তখন কোন ছোট প্রশ্ন থাকতই না। পাতার পর পাতা লিখে হাত ব্যথা হয়ে গেলেও নম্বর তোলা খুবই কঠিন ছিল। তাই বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যে যুগে অসম্ভব ছিল। তবু ছিল পাশ করাতেই আনন্দ, ছিল সহপাঠীদের সাহচর্যে কাটানো একমুঠো ভাললাগার ভালবাসার স্বর্গ।

সরস্বতী পূজোয় শাড়ী পরে কলেজে যাওয়া, গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা ফুচকাওয়ালা র কাছে ফুচকার চেয়ে, বেশি করে তেঁতুল জল চেয়ে খাওয়া, ক্যান্টিনের চপ, ঘুগনি আর ফেরার পথে হেমন্তিকার অব্যর্থ লক্ষ্যে ছোঁড়া ঢিল দিয়ে পশু হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে আম পাড়া, কলেজ ক্যাম্পাসের কুল গাছের তলায় পড়ে থাকা কুল কুড়িয়ে খাওয়ার মধুর স্মৃতিগুলো আজ যেন বার বার ফিরিয় দেন সদ্য যৌবনের দিনগুলোতে।

জে কে কলেজে গিয়ে অনার্সের পরীক্ষাগুলো দিয়ে এলাম। পাশ, এডিশনাল গুলোর পরীক্ষা আমাদের কলেজেই হল। পরীক্ষা শেষ, রেজাল্টের চিন্তা নেই, বুবুদের বারান্দায়, কিম্বা মিমিদের বৈঠকখানায় সারাদিন টিউশন শেষে জমাটি আড্ডা। 'বেলা বয়ে যায়, ছোট্ট মোদের পানসি তরী সঙ্গে কে কে যাবি আয়।' ইস আবার যদি ফিরে পেতাম সেই দিনগুলো।

এর মধ্যেই আমাদের বাংলার কনিষ্ঠ অধ্যাপিকা পাপিয়াদির বিয়ে হয়েছে, পাপিয়া ঘোষ থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন। আমরা হাঁ করে দেখতাম আমাদের একমাত্র বিবাহিত অধ্যাপিকাকে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উনি পুরুলিয়া ছেড়ে চলে গেলেন স্বামীর কর্মস্থলে। আমরা হারালাম বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকে।

তবে সে দুঃখ স্থায়ী হয়নি। পার্ট টু, মানে থার্ড ইয়ারে উঠেই আমাদের বাংলা বিভাগে যোগ দিলেন তরুণ অধ্যাপক স্যার প্রবীর সরকার। স্পেশাল পেপার এ মাইকেল এর রচনা পড়াতেন। আমরা স্যার এর প্রথম ব্যাচ। আর আমাদের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক। এর আগে সবাই দিদি ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি স্যার এর পড়ানোর এক আমোঘ আকর্ষণে আমরা প্রায় সবাই ওনার ক্লাসের প্রতীক্ষা করতাম। তিন তলায় ওনার ক্লাসের শেষে সহপাঠীদের আমার নোট খাতা কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতাম। অষ্টআশী সালে পুরুলিয়াতে পা দেওয়া সেদিনের তরুণ অধ্যাপক, আজ পুরুলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন, লিখেছেন পুরুলিয়ার ইতিহাস, লোকসংস্কৃতির বিষয়ে কত বই। আমরা, তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীরা ওনার খুব স্নেহের ছিলাম। কলেজের সামনের মাঠে, এখন যেখানে আর মাঠ নেই শুধু কংক্রিটের জঙ্গল, সেখানেই সেবার স্পোর্টস হয়েছিল। অধ্যাপকদের দৌড়ে স্যার যখন প্রথম হলেন, আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলাম, উনি আমার মাথায় হাত

দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই কলেজ স্পোর্টস এ যূথিকাদির নির্দেশ এ আমরা কজন, যারা খেলাধুলায় অপটু, তারা ভলান্টিয়ার হয় একটা করে ফাইবারের বাটি পেয়েছিলাম, যা আজও আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে।

এই তৃতীয় বর্ষেই প্রথম কলেজে ভোট হল। আমাদের বন্ধুরাও ভোটে দাঁড়িয়ে ছিল। দোলা, বাবলি, শ্রীলেখা, আরো অনেকে। লাইন দিয়ে ব্যালট পেপারে ভোট দিলাম। স্যারেরা যখন গণনা করছিলেন, তখন বেশ উত্তেজনা। তারপর রেজাল্ট। কেউ জিতেছিল, কেউ হেরে গলা ছেড়ে কেঁদেছিল, কিন্তু প্রথম কলেজে ভোট হবার সেই উত্তেজনাময় অথচ সুশৃঙ্খল পরিবেশটার আজ বড় অভাববোধ করি।

এরপর ভীষণই দ্রুত সময়টা পার হয়ে গেল। কলেজে পড়তে পড়তেই রূপার বিয়ে হয়ে গেল, আমাদের চার সঙ্গীর একজন কমে গেল। খুব তাড়াতাড়ি পার্ট টুর পাট চুকলো। আমার সোনাঝরা দিনগুলোর ইতি ঘটল, অচিরেই সংসার সমুদ্রে ডুব দিতে হল তারুণ্যের খোলস ছেড়ে।

পড়ে থাকল একরাশ মধুর স্মৃতি মাখা ঝরাপাতা তিনটি বছরের অনাবিল অনুভব।

-ঃ-

Suparna Goswami (2nd Year)

হুদুড়াঃ ছীন ঃ হুদুড়ের অন্তর্ধান

— **সাম্যশান্তি কিস্কু**
প্রাক্তণ ছাত্রী

সাঁওতালীতে একটা প্রবাদ আছে 'বঙ্গা বুরুদ বাক জন্ম আ, বাক গুজুঃ আ; বঙ্গা বুরুদক 'মুলুঃ ঘওয়া, আর ক 'উছৌন' বা 'ছীন 'আ'। অর্থাৎ দেব-দেবীর জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না; তাদের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান ঘটে। এই প্রসঙ্গে সাঁওতাল সমাজে বহু বঙ্গা বুরু অর্থাৎ দেব-দেবীর কাহিনী আছে।

শোনা যায় এক গ্রামে 'হুদুড়' নামে এক আদিবাসী রমনী ছিল। সে 'অং' শক্তির অধিকারী ছিল। এই 'অং' শক্তির সাহায্যে মুখ দিয়ে আগুন বের করতে পারত। আর এই 'অং' শক্তির সাহায্যে সে অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে পারত। (বাংলায় 'অং' শব্দের অর্থ হল ফু দেওয়া।) এই খবর পেয়ে 'মারাং বুরু' অর্থাৎ শিব ঠাকুর সাঁওতাল গ্রামে আসে। গ্রামের মাঝি অর্থাৎ গ্রামপ্রধান গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলে—

গুরুহ পূরব খন চঞ?
গুরুহ পশ্চিম খন চঞ?
গুরুহ কিন আঁড়গ আকান।
গুরুহ দুড়ুপ মেতা কিন পে।
গুরুহ দুড়ুপ মেতা কিন পে।
গুরুহ গোড়া উমুল রে।
গুরুহ গান্ড মুতুলরে।

গুরুহ অর্থাৎ গুরুদের শ্রেষ্ঠ যিনি। এখানে শিবকে বলা হয়েছে গুরুহ। সাঁওতালরা মারাং বুরু নামে যে দেবতার পূজো করে তিনি শিব। 'মারাং বুরু' এই কথাটার সাধারণ অর্থ করলে দাঁড়ায় বড় পর্বত অর্থাৎ হিমালয়। এখানে শিব থাকেন বলে শিবকে মারাং বুরু বলা হয়।

এখানে মাঝি গ্রামবাসীদের যে কথা গুলি বলেছে সেটি হচ্ছে একটি গান, এটি 'দাঁসায় সেরেঞ ' নামে পরিচিত। মাঝি এই গানের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের মারাং বুরুকে বরণ করে নেওয়ার কথা বলেন। সেরেঞ এর অর্থ এই— মাঝি জানে না মারাং বুরু 'গুরুহ' কোথা থেকে আসছেন। তাই তার প্রশ্ন গুরুহ পূর্ব থেকে এসেছেন নাকি পশ্চিম দিক থেকে এসেছেন। গুরুকে যেন তারা বসতে বলেন। গুরুহকে যেন বসতে দেওয়া হয় গোয়ালের ছায়ায় কিম্বা পিড়ায়। যাইহোক মারাংবুরু গ্রামে আসার উদ্দেশ্য জানায় গ্রাম প্রধান অর্থাৎ মাঝিকে এবং হুদুড় নামে রমণীর কাছে মহিষাসুরকে বধ করার জন্য 'অং' শক্তির সাহায্য প্রার্থণা করে। হুদুড় রাজা হয়। মারাং বুরু হুদুড়কে নিয়ে যায়। হুদুড় তার সমস্ত 'অং' শক্তি মা দুর্গাকে দিয়ে বিলীন হয়ে যায়। সাঁওতালী ভাষায়— '..' (হুদুড় আয়াঃ যত দাড়ে দুর্গে আরো এম কাতেৎ এ উছীন এনা।) তারপর থেকে হুদুড়কে আর খুঁজে পাওয়া।

বি:দ্র:— ব্রহ্মার বলে বলিয়ান মহিষাসুরকে বধ করতে দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহারের সময় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে হয়েছিল দেবী দুর্গাকে। হুদুরের কাছ থেকে পাওয়া শক্তিও প্রয়োগ করেছিল দেবী দুর্গা অসুর নিধনে। হুদুড়ের কাছে এই শক্তি পেয়েছিল বলে দেবী দুর্গাকে হুদুড় দুর্গাও বলা হয়ে থাকে।

সাঁওতালরা দেবী দুর্গাকে আহ্বান বা বরণ করেছিল দাঁসায় নাচের মধ্য দিয়ে। এই নাচ দাঁসায় চাঁদ অর্থাৎ

আশ্বিন মাসে হয়ে থাকে। এই নাচ শুরু হয় মহালয়ার কয়েকদিন আগে থেকে এবং চলে বিজয়া পর্যন্ত। এই নাচ পুরুষদের নাচ। এই নাচের সময় সাঁওতাল পুরুষেরা সাধারণ পুরুষদের যে পোশাক সে পোশাক পরে না; নারীর পোশাক পরে। সেটা নারীর মতো করে হোক কিংম্বা শাড়ীকে ধুতির আকারে করে হোক। এই অবলম্বন বা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল মহিষাসুরের হাত থেকে রক্ষার জন্য। যাতে দুর্গাকে আহ্বান করতে গিয়ে মরতে না হয়। কারণ তারা জানত মহিষাসুর ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল কোন নর তাকে বধ করতে পারবে না। তাই তার কাছে যেখানে পুরুষ শক্তি পরাস্ত সেখানে নারীশক্তিকে পরাস্ত করা খুব তুচ্ছ কাজ। সেই থেকে আজও এই নাচ চলছে। যদিও আগের মতো এখন আর দেখা যায় না।

--ঃ--

ওরাঁও সমাজ

— **নির্মলা ওঁরাও**
প্রাক্তনী

দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, শীলাবতী, দ্বারকেশ্বর, বৈতরণী বুড়ীবালাম, অজয়, ময়ূরাক্ষী, বরাকর প্রভৃতি নদীগুলি দ্বারা আবদ্ধ একটি বিশাল ভূ-খণ্ড যার ঐতিহাসিক নাম "ঝাড়খণ্ড"। এই ভূখণ্ডের একদিকে রাজমহল পাহাড়, মধ্যভাগে দুমকার হিজল। রাঁচীর জনা জারগাঁ, পালামৌ প্রভৃতি। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির অযোধ্যা পাহাড় ও সিংভূমের দলমা, ময়ুরভঞ্জের সিমলিপাল পাহাড়, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া ও পুরুলিয়া পাঞ্চেৎ যেন এর ভিতকে শক্ত করেছে। →

ভারতীয় উপমহাদেশে এই বিশাল ভূ-খণ্ডের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যে গোষ্ঠীগুলি ছিল, ওঁরাও সমাজ তাদের মধ্যে অন্যতম। ছায়াবৃত অরণ্য, পাহাড়, ডুংরী, টিলা, পাহাড়ী চালের ঝর্ণা, নদী, তারই মাঝে জঙ্গল কেটে উদ্ধার করা চাষ জমি ছিল ওঁরাওদের পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। জীবনযাপনের অবাধ ক্ষেত্র। সারা বছর ধরে নানা উৎসব, নিজস্ব গান, নাচের মাধ্যমে জঙ্গলকে আপন করে নিয়েছিল। শাহরুল, বাহা, করম, প্রভৃতি উৎসবে শালফুল, কুঁড়চি, মহুয়া ফুলের সাদা রং এই জঙ্গল কেন্দ্রিক মানুষ গুলোকে কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে। দালমাবুরু, অযোধিয়া বুরু, রাঙাহাড়ি প্রভৃতি দেবতাদের বিশ্বাসে আদিবাসী ওরাঁও মানুষরা ছিল সুখী। প্রকৃতির মতই তারা ছিল সরল, শান্ত, সুন্দর, ছল চাতুরী ছিল তাদের অজানা।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ও বড় গোষ্ঠী ছিল ওরাঁও তাঁদের অন্যতম। যারা অসভ্য, জংলি, বুনো, আদিম, ছোটজাত বলে পরিচিত ছিল। এরা পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দী ধরে ইংরেজ রাজশক্তি ব্যবসা ও শাসনের প্রয়োজনে এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, ভোট কেনাবেচার কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী ভাগ হয়ে যায়; এমনকি 'ওরাঁও' রা ভাগ হয়ে যায় এবং তাদের জমি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ওরাঁওদের প্রচলিত কয়েকটি ভাষা ঃ-

এসেছিলাম →(আসিনছিলি)
চলে যাওয়া (গেলেনই) মা — আয়্